কোনো খেদ নেই

রফিক আজাদ

ঐতিহ্য

সামান্য কথন

এই লেখাটি আমার চিন্তার মধ্যেও ছিল না। 'আড্ডা'র ওপরে পাক্ষিক 'অনন্যা'য় এটি সামান্য ক'টি কিস্তিতে ছাপা হয়। সে-ও সম্ভব হয়েছিল নিষ্ঠাবান নাট্যকর্মী প্রতিভাবান নির্দেশক অনুজপ্রতিম অলক বসুর ঐকান্তিক ইচ্ছায়। প্রথম দিকের বেশ ক'টি কিস্তির অনুলিখন নিয়েছিলেন অনুজ কবি শিহাব শাহরিয়ার।

'অনন্যা'য় প্রকাশিত অংশটি শুধু 'আড্ডা' সংক্রান্তই ছিল।

এরপরে কবি ফারুক মাহমুদের নাছোড় ইচ্ছের কাছে হার মেনে বাকিটা হয়ে উঠতে পেরেছে।

অতঃপর 'আমার দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত রচনাটিই শেষ পর্যন্ত এই বইয়ের আকার নিয়েছে।

জন্ম থেকে ১৯৬২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পর্যন্ত এই বইয়ের বিস্তার।

বিশ শতকের ষাটের দশক সারা পৃথিবীতেই এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই দশকেই কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বিরলকেশ বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে পৃথিবীজুড়ে তারুণ্যের উত্থান ঘটে। '৬৮-র প্যারিস সম্মেলন তার প্রমাণ; দার্শনিক জ্যাঁ পোল সার্ত তরুণদের ইশতেহার নিজে ফেরি করে বিক্রি করেন। সার্ত ও তরুণদের লক্ষ্য ছিল একটাই রক্ষণশীলতার দুর্গ চুরমার করা।

আমাদের দেশ এবং বাঙালির জীবনের জন্যেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দশক। কুখ্যাত হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে '৬২-র আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬৬-র ছয় দফা হয়ে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই সময় সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। আত্মজীবনীর ২য় অংশে যদি সম্ভব হয় কখনো তবে সে চেষ্টাই করবো। তৃতীয় খণ্ডটি অবশ্যম্ভাবীভাবে '৭১ পরবর্তী সময়কাল থেকে বর্তমান সময়পরিধি পর্যন্ত ধরার চেষ্টা থাকবে।

রফিক আজাদ
১লা ফাল্গুন ১৪১৫
ধানমণ্ডি, ঢাকা

'প্রান্তবাসী মানুষ' হিসেবে আমি চিহ্নিত হয়ে আছি সেই চর্যাপদের যুগ থেকে। কিংবা আরো আগে, গ্রিক যুগে, প্লেটোর সময় থেকে। অনাদিকালের সেই 'কবি'র প্রতিনিধি ছাড়া এই আমি ভিন্ন কেউ নই। অন্য কবিরাও তাই-ই। সত্যি কথা বলতে কি, আড়াই আমার প্রাণ; আমি সেই 'তিমি' যার আনন্দ অপার অসীম নীলজলে অবগাহনে। আড্ডাই আমার সেই অসেতুসম্ভব নীলজল, লোকেরা যাকে 'সমুদ্র' বলে থাকে। আমার অবগাহন সেই অগাধ, অপার, অতল নীলজলে। যাতে মালিন্য নেই, কাদাজল নেই; শুধুই আনন্দে অবগাহন আছে।

তো, বলছিলাম– আড্ডা আমার রক্তে, কবিতা আমার শিরা উপশিরায়। আমার বাবা বিষম আড্ডাপ্রিয় মানুষ ছিলেন; বৈঠকখানায় সমমনা গ্রামীণ মান্যজনের সঙ্গে নিত্যদিন হুঁকোতে খাম্বিরা তামাক সহযোগে সধূম আড্ডা; ধুম আড্ডাও বলা যায় তাকে। মনে আছে– আমি তখন খুব ছোট। বাড়ির ভেতর থেকে পাঠানো বৈঠকখানায় বাবার আড্ডায় কাঁচালঙ্কা-পেঁয়াজ-সর্ষে তেলে মাখানো গামলাভর্তি মুড়ি, আদা-চা আর খাম্বিরা তামাকে আর বাবার বন্ধুদের হা-হা হাসির রবে মুখরিত ছিল 'গুণী' গ্রামের সেই ছোট্ট আকাশ। আড্ডা তাই আমার রক্তে। নেশা-ও। বাবার নেশা ছিল প্রথমে মোদকে, পরে অহিফেনে। দেখেছি নিজের চোখে, মশা তার রক্ত খেয়ে ঢলে পড়ত মৃত্যুর কোলে। Snake bitt নিতে অবশ্য দেখি নি। কিন্তু শুনেছি তাঁর পূর্বপুরুষেরা নাকি ছোট্ট সুদৃশ্য ঝাঁপি খুলে গোখরোর ছোবল নিতেন জিহ্বায় এবং সানন্দে দু'তিন দিন ঘুমিয়ে কাটাতেন। রূপের গরিমায় মাতাল আমার দিদা প্রায়শই এই গল্প করতেন এবং বাঙালিদের নিম্নকুলোদ্ভব বলে খুবই গালমন্দ পাড়তেন। এখানে বাহুল্য বলা যে, আমার দিদার গায়ের রঙ ছিল দুধে-হলুদে মেশানো– দুধ কম, হলুদ বেশি। নাক ও চোখ মঙ্গোলীয়দের যা হয়, তেমনই– কিন্তু সেই বোঁচা নাকের ঘ্রাণশক্তি কুকুরকেও হার মানাত; আর কী দৃষ্টিশক্তি!– যাকে বলে শ্যেনদৃষ্টি! যদি কখনো কারু চোখে তাকাতেন তো মনে হতো এক্কেবারে অন্তরটা দেখে নিচ্ছেন। ওহ, এ রকম মহিলা এই বয়স

অবধি আমি দ্বিতীয়টি দেখলাম না! তো, আমার মা আধা-সেমেটিক, আধা-বাঙাল– কী যে খড়্গহস্ত ছিলেন আমার দিদা আমার এই ব্রাত্য মায়ের ওপর, তা আর কহতব্য নয়।

জি, আমি ভুলে যাই নি যে, আমার বিষয় : আড্ডা ! কিন্তু এইটুকুন বর্ণনা কি আমি প্রত্যাশা করতে পারি না, কথাশিল্পী নই বলে? যুক্তিটা হলো এই যে, বাঙালি তার প্রথম করণীয় কাজটি কখনোই নিজে করে নি। সবকিছুই অপরে করে দিয়েছে। যেমন ধরুন– তার ব্যাকরণ, তার অভিধান, তার গদ্য, তার নাটক ইত্যাদি। ওই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাকে নিয়ে এত অহঙ্কার বাঙালির, তিনিও কিন্তু কাশ্মীরী-ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। তো? –এত অহঙ্কার কীসের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আপনাদের?– আছে, আপনাদেরও অহঙ্কার করার জন আছেন– তাঁরা হলেন বিজয় সিংহ ('আমাদের ছেলে/বিজয় সিংহ/হেলায় লঙ্কা/করিল জয়'), শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, সুভাষচন্দ্র বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মেঘনাদ সাহা, শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, ভাসানী, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ ও শেখ মুজিবুর রহমান। রবীন্দ্রনাথের কথা তো আগেই বলেছি।

ধান ভানতে শিবের গীত থামাই এবার। আড্ডার প্রসঙ্গেই আসি। আড্ডা সাহিত্যের জননী না হোক ধাত্রীমাতা তো বটে। আড্ডা দেন নি এমন চিত্রকর-গায়ক-কবি-সাহিত্যিক-নটনটী-খেলোয়াড় ভূ-বাংলায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাহুল্য বলা যে, এর মধ্যে শুধু পুং নয় স্ত্রী-লিঙ্গও অন্তর্ভুক্ত। একদেশদর্শী বলে আমার দুর্নাম রটাতে পারবেন না কোনো পাঠিকাই। কারণ, যতদূর মনে পড়ে, আমি কবিতা লিখেছি 'আমার গর্ভে, আমারই ঔরসে'– নিজেকে একাধারে মা ও বাবা কল্পনা করে। তো যা বলছিলাম– আড্ডা দিচ্ছি খুব ছোট্টকাল থেকে– তেরো/চৌদ্দ বছর বয়স থেকে। আড্ডার জন্য খুব ছোট্টকালে আড্ডাবাজ বাবার কাছে ঠ্যাঙানি খেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম– পি. সি. সরকারের কাছে গিয়ে 'ম্যাজিক' শিখব বলে। যাওয়া আর হয় নি। মাঝপথে ট্রেনে আরেক পি. সি. সরকার, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ স্কুলের প্রবীণ সুদর্শন হেডমাস্টার (নাম জানা হয় নি তার, তিনিও একই ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছিলেন দর্শনা হয়ে), ফিরতি ট্রেনে আমাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তায় তিনি আস্তে আস্তে আমার ঠিকানা আমার কাছ থেকেই আদায় করে পকেটে রক্ষিত পোস্টকার্ডে আমার বাবার ঠিকানা লিখে আমাকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

সে এক আশ্চর্য মানুষ! চোখের সামনে এরকম এক আশ্চর্য পিসি সরকার দেখে ক্লাস সেভেনে পড়া বালক (১৯৫৬) আমি হতভম্ব হয়ে যাই। কান্না-উদ্রেককারী আবেগ তিনি আমার মধ্যে জারিত করে দিয়েছিলেন। 'খোকা, তোমার মাকে মনে পড়ে না? যে বাবা তোমাকে মেরেছেন তিনি কি কখনো তোমার কপালে চুমো খান নি? তুমি যখন অসুস্থ– জ্বরে ভুগছো, তোমার বাবা কি কপালে জলপট্টি দেন নি। ডাক্তার ডাকেন নি? তোমার একটি বোন, একটি ভাই আগুনে ('Black fever') ও জলে মারা গেছে, তাদের জন্যে কি তিনি এখনো অশ্রুবিসর্জন করেন না? (তারা তোমার বাবা ও মা) কি এতক্ষণে উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছেন না তোমার জন্যে? তবে কেন তুমি একা, এই বয়সে বিদেশবিভূঁইয়ে ঘুরে মরবে? ম্যাজিক শিখতে যদি এতই ইচ্ছে তো তোমার বাবা-মা-ই তোমাকে টাঙ্গাইলের ঐ কৃতী সন্তানের কাছে নিয়ে যাবেন। –কি, যাবেন না? এই দ্যাখো তোমার বাবাকে আমি লিখে দিচ্ছি, তিনি যেন আর কোনোদিন তোমাকে মারধর না করেন। ভদ্রঘরের ছেলে তুমি– ইন্টেলিজেন্ট– ফিরে যাও ঘরে– এত টাকা তোমার সঙ্গে টের পেলে খারাপ লোকেরা তোমাকে মেরে ফেলে টাকাটা নিয়ে নেবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। "তাছাড়া তোমার তো পাসপোর্ট নেই, তুমি যাবে কী করে ওপারে, ভারতে?"– ততক্ষণে আমাদের ট্রেন কুষ্টিয়া স্টেশনে এসে পৌঁছে গেছে। এখান থেকেই দ্বিতীয় পি. সি. সরকার ট্রেন বদল করে দর্শনা হয়ে বর্ডারে চলে যাবেন। তার ট্রেন আধঘণ্টা পরেই ছাড়বে। আমার জন্য দুশ্চিন্তিত সেই মহাপুরুষ, ঈশ্বরগঞ্জ স্কুলের প্রবীণ হেডমাস্টার, আমার দ্বিতীয় পি. সি. সরকার– আমাকে স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় রেখে তার জন্য অপেক্ষমাণ ট্রেনে উঠে গেলেন। ইতোমধ্যেই, অত্যন্ত অল্প সময়ে, কুষ্টিয়ার স্টেশন মাস্টারকে ইতঃকর্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ময়মনসিংহগামী ফিরতি ট্রেন দেড় ঘণ্টা পরেই। ওতেই উঠে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। স্টেশন মাস্টার সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে নিয়েছেন। কী আর করা। ফিরতে যখন হবেই, তবে এই সময়টায় কুষ্টিয়া শহরটা এক নজর দেখে যাই। একাকী আর যাওয়ার উপায় আছে? দায়িত্বপ্রবণ স্টেশন মাস্টার সঙ্গে একজন গার্ড দিয়ে দেন। ওই আড়কাঠির সঙ্গেই রিকশায় উঠে একটি মাত্র বড় রাস্তার শহর কুষ্টিয়া ঘুরে দেখি; সব মফস্বল শহরের মতোই এটাতেও প্রধান অভিজাত পল্লী থানাপাড়া। তবে এই শহরের প্রধান দর্শনীয় বস্তু দেখি মোহিনী মিল; মোহিনী মিলে যাওয়ার পথে আড়কাঠি আমাকে দেখায় Tagore Lodge, এখানেই নাকি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তার পুত্র

দেবেন ঠাকুর ভুষিমালের কারবার করতেন! এত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাগুলো আড়কাঠি বলছিল যে, শুনে কিশোর বালকের খুবই খারাপ লেগেছিল। আরো একটি কথা ওই লোক বলেছিল, "খোকা, সময় হাতে নেই, না হলে তোমাকে এই মোহিনী মিলের পরেই একটি জায়গায় নিয়ে যেতাম যেখানে হযরত লালন শাহ শুয়ে আছেন। যার লেখা চুরি করে ওই টেগোর লজের ছেলে রবিঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছে।' ক্লাস সেভেনে পড়া বালক ইতোমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে মোটামুটি জেনে গেছে। তাঁকে এরকমভাবে তাঁর অনেক মুসলমান শিক্ষকই ভুল-ভাল শেখানোর চেষ্টা করেছেন প্রাথমিক স্কুল পর্যায়েই। যেমন : নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভাবান জেনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার ভাইঝিকে তার সঙ্গে (নজরুলের) বিয়ে দিয়ে ধুতুরা খাইয়ে পাগল করে দিয়েছিলেন! নইলে নোবেল পুরস্কার তো নজরুলেরই প্রাপ্য ছিল। এরকম ষড়যন্ত্র করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নোবেল পুরস্কার জিতে নেন।

২

জন্ম আমার ব্রিটিশ ভারতে কিন্তু হাতেখড়ি '৪৭-এর পরে। শিক্ষকদের মধ্যে যদিও অধিকাংশই ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত; কিন্তু ২/৪ জন মুসলমানও ছিলেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত স্যার (আহসানউল্লাহ, অঙ্কের স্যার) ও ইসমাইল স্যার (বিজ্ঞান ও ভূগোল পড়াতেন) ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। এঁরাই সর্বক্ষণ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বলতেন। বাংলা পড়াতেন ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য, ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ। বদরাগী, বিদ্বান। ক্লাসে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। পালা করে তাঁর পাকা চুল তুলে দিতে হতো, যখন ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ি। আমার পালা এলে কাঁচা চুল তুলে ঘুম ভাঙিয়ে ফেলতাম তার। এ কারণে আর আমাকে পাকা চুল তোলার দায়িত্ব পালন করতে হতো না। শাস্তিস্বরূপ 'ব্যাকরণে'র একেকটা সূত্রের পরীক্ষা দিতে হতো প্রতিদিন। এই মহান শিক্ষকের কাছেই আমি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ নিই। 'আনন্দমঠ' যে আমাদেরই মধুপুর গড়ের ভেতরে এক ঐতিহ্যবাহী মঠ, তা জানতে পারি! পরে অবশ্য মধুপুরের 'আনন্দমঠে'র স্থাপত্য-সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করে। [১৯৭১ সালে বর্বর পাকসেনারা এই মূল্যবান প্রত্ন-সম্পদ ধ্বংস করে।] তো, যা বলছিলাম, (১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার) যার জন্ম, তাকে পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা খুবই শক্ত। কেননা, দুগ্ধপোষ্য ওই শিশুর বয়স যখন ৭ বছর, তখনই, পাকিদের বাবা জিন্নাহ্ বলেছিলেন 'Urdu and Urdu will be the state language of Pakistan।' সাত বছর বয়সের শিশুর 'উর্দু ও পাকিস্তান'-এর কোনো মূল্য বোঝার কথা নয়। তখনো আমি, বাবা-মার সর্বশেষ সন্তান, মায়ের বুকের দুধ খাই এবং মাকে 'আম্মা' না বলে 'মা' কয়ে ডাকি। 'মা কথা মধুর বড়/সুধার সমান/কহিতে-শুনিতে ডাক/জুড়ায় পরান।' তো, 'মা, বলিতে প্রাণ করে আনচান'– এরকম সন্তানের কানে সাম্প্রদায়িকতার কুমন্ত্রণা দিয়ে কি কোনো লাভ আছে?

আমাদের ওই স্কুলের নাম ছিল সাধুটী মিডল ইংলিশ স্কুল (Sadhuty M. E. School)। Middle অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। স্কুল লাইব্রেরির সব বই আমি ক্লাস ফাইভে থাকতেই পড়ে ফেলি। এর মধ্যে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরাণী*, *কপালকুণ্ডলা*, *আনন্দমঠ*। সেই থেকে বঙ্কিমের ভক্ত আমি, বিশেষ করে তাঁর ভাষা-সৌকর্যের। পরে অবশ্য, অনেক পরে– ব্যথিত হয়েছি, যখন দেখেছি আমার আদর্শ মানব বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ তিনি করেছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই– 'ব্যথিত', বিরূপ হই নি। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম দু'জনকেই আমি এখনো সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। অবশ্যই দু'জনকে দুই ভিন্ন কারণে। একজনকে আদর্শ মানুষ হিসেবে, অন্যজনকে সাহিত্যিক কারণে।

ফিরতি ট্রেনে রওনা দেয়ার আগে কুষ্টিয়া স্টেশনের উল্টোদিকে একটি হোটেলে খেয়ে নিই। খেয়ে-দেয়ে বেরুনোর মুখে জীবনের প্রথম মধুক্ষরা, শুদ্ধ, সুসংস্কৃত বাংলাভাষায় কথা শুনি! এক বৃদ্ধ ভিখারিণী 'বাবা, দুটো পয়সা দোবে?'– বলে তার হাত বাড়িয়ে দেন। ময়মনসিংহ জেলার ছেলে আমি, 'করছুইন, গেছুইন, খাইছুইন' শুনেই অভ্যস্ত; টাঙ্গাইলের ভাষা অবশ্য ময়মনসিংহের থেকে আলাদা– করছাল, গেছাল, খাইছাল ইত্যাদি। প্রচল আছে : 'বাবা বাজার থিকা কই মাছ আনছাল, মা বালা কইরা রানছাল, কী মজাই হইছাল।' ক্লাসরুমে শুদ্ধ বাংলা শুনেছি বটে স্যারদের মুখে। সেটিকে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা বলে মনে হয় নি, ওটিকে পড়ালেখার ভাষ্য, বিশেষ ভাষা হিসেবেই দেখেছি। যেমন : ঘরের উঁচু একটি কোনায় ছোট্ট মাচায় লালসালুতে মোড়ানো 'কুরআন শরিফ' ভাঁজ করা রেহেলে রাখা থাকে, তেমন একটি ব্যাপার। এই ভাষায় ভিক্ষা করা চলে! এ যে অসম্ভব! নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না; এমন নির্ভুল, শুদ্ধ সুরেলা উচ্চারণ। ভিখারিণীর গলাটিও প্রায় হুবহু সুচিত্রা সেনের মতো। এখনো কানে লেগে আছে সেই স্বর! মন্ত্রমুগ্ধের মতো পকেটে হাত দিয়ে আমি পুরো একটা দশ টাকার নোট দিয়ে দিই! এখনো কান পেতে শুনি সেই স্বর, প্রিয় ভিখারিণীর কণ্ঠস্বর– যেন আমারই মায়ের গলা– আমার কানে আছড়ে পড়ে আমার মায়ের কাতর প্রার্থনা! এই প্রার্থনা মুহুর্মুহু আমার কানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত হয়ে বাজে, যেন আমার মাতৃভূমি সমৃদ্ধ দেশগুলোর কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে একমুঠো 'অন্ন'। বিশ্বব্যাপী আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই স্বর : 'অন্ন চাই, অন্ন দাও।' এই ঘটনা জীবনব্যাপী আমি একাকী বয়ে বেড়াচ্ছি। দরিদ্র এই দেশের জন্য তাই আমার মায়ার কোনো অবধি নেই। হতদরিদ্র এই বৃদ্ধা

ভিখারি প্রতীকার্থে সর্বদাই ছায়া ফেলেন আমার মনে, মননে। ব্যক্তিজীবনে আমি অলস, দীর্ঘসূত্রী, কর্মবিমুখ এবং গভীর অর্থেই আড্ডাবাজ মানুষ। অপরিণামদর্শী। মাঝে-মধ্যে কর্তব্য আমাকে ডাকে, দায়িত্ব আমাকে জাগায় গভীর এক আলস্যের গহ্বর থেকে। ক্ষণিক তাড়নায় জেগে উঠে আবার দায়িত্বজ্ঞানহীন আড্ডার মোহে মগ্ন হই। আড্ডাই আমাকে সৃষ্টিশীলতার পক্ষে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। এই নিভৃতচারিণী গোপন প্রেমিকাই আমাকে বারবার বাঁচিয়ে দিয়েছে বৈষয়িকতার চোরাবালিতে ডোবার হাত থেকে। বিষয়ও আমাকে টানে, কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না।

তো, যা বলছিলাম। ফিরতি পথে জগন্নাথ ঘাটে এসেই দেখি জ্ঞাতি মোহাম্মদ কাক্কুর উদ্বিগ্ন চোখ-মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল, অশ্রুসজল। খপ করে আমার হাত ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেন অপেক্ষমাণ ট্রেনের দিকে। ট্রেনে উঠিয়ে তবে কথা। জানতে পারলাম চতুর্দিকে বাবা লোক পাঠিয়েছেন আমার খোঁজে, মা সেই তখন থেকেই অজ্ঞান, জ্ঞান ফেরার পর একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করেই আবার জ্ঞান হারান, 'বাবা আমার একা যায় নি সঙ্গে শত্রু নিয়ে গেছে।' শত্রু অর্থাৎ প্রচুর টাকা। যা হোক, মোহাম্মদ কাক্কুর হাত ধরে বাড়ি তো ফিরলাম। পরিবেশ থমথমে। বাড়িভর্তি আত্মীয়স্বজন। কারু মৃত্যুতে যেমন সবাই আসে, তেমন পরিবেশ। কারু সঙ্গে তেমন বাক্যবিনিময় নয়– সোজা বাবা-মার ঘরে। মা শয্যাশায়ী, পাশে বাবা বসে। আমি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি মায়ের বুকে। মায়ের চোখের জল অবিরল। গোটা জল পাত্রে ধরতে পারলে আমার একবেলা স্নান সারা হতো! বাঙালি মায়ের সম্বল তো অবিরল অশ্রুজল। এই অশ্রুর মূল্য যদি আমরা, সন্তানেরা দিতে শিখতাম! 'মা, কথা মধুর বড়, সুধার সমান।' এই মাকে আমরা কতভাবেই না অবহেলা করে থাকি! পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, একেকটা সন্তান যে মাথা-উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তার পেছনে রয়েছেন একেকজন মা। মায়ের যত্নে, তার অশ্রু ও আশীর্বাদ থেকে জন্ম নেয় একেকজন মহান মানুষ। এহেন মা ও মাতৃভূমির প্রতি আভূমি নত নয় যে মানুষ তার মতো নরাধম ও ধিক্কারযোগ্য আর কে আছে!

আমাকে বুকের নিভৃতে টেনে নিয়ে আর তো ছাড়েন না মা। আমিও তার অশ্রুসায়রে নেয়ে উঠে আসি স্নেহের স্নিগ্ধ সৈকতে। এরপর আছড়ে পড়ি পিতার পদতলে। দু'হাতে বুকে তুলে নেন তিনি। বিস্মিত আমি এতদিন যাকে জানতাম পাষাণহৃদয় এক শাসক, যার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা জোগাত না - শুধু শাসন আর নানাবিধ বিধিনিষেধের অনুশাসন– সেই পিতার

স্নেহার্দ্র আলিঙ্গন আমাকে আর্দ্র থেকে আর্দ্রতর করে তোলে ভেতর থেকে। নিজেকে ধন্য মনে হয়। এত আকাঙ্ক্ষিত আমি আমার বাবা-মা'র কাছে! ক্ষয়িষ্ণু এক অভিজাত পরিবারের সব বাহ্যিক আবরণ মুহূর্তের মধ্যে ধসে যেতে দেখি। গ্রামের সমবয়সীদের সঙ্গে তো নয়ই, কারুর সঙ্গেই সৌজন্য সম্বোধনের বাইরে কোনো সম্পর্ক রাখার উপায় ছিল না যে কিশোরের, সেই কিশোর এরপর থেকে সামান্য হলেও কিছুটা 'স্বাধীনতা' পেয়েছিল ঘুরে বেড়ানোর, যদিও সঙ্গে কারুকে-না-কারুকে দেয়া হতো, পাহারাদার হিসেবে। এরকম কঠিন অনুশাসনে বেড়ে-ওঠা কিশোর যদি কোনোদিন অবারিত স্বাধীনতা পেয়ে যায় তো সে পরবর্তীকালে তুখোড় আড্ডাপ্রিয় হয়ে উঠবেই। স্বাধীনতার এই অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ পেয়ে সে হয়ে উঠবেই আকর্ষণীয় এক স্বেচ্ছাচারী। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে।

ফিরে তো এলাম। দু'টি দিন কেটে গেল মায়ের চোখের সামনে। চোখের আড়ালে যাওয়ার উপায় নেই। ঘর থেকে বেরুনোর কোনো তাগিদও ভেতর থেকে অনুভব করি নি। এক ধরনের অপরাধবোধ ও লজ্জা আমাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছিল। আত্মীয়স্বজনদের সামনেও বেরুতে পারি নি লজ্জায়। কেউ তেমন ডিস্টার্বও করেন নি আমাকে। বাবার আচরণে আরো বেশি লজ্জিত বোধ করেছি। হাতে তুলে খাইয়ে দিয়েছেন। যে মানুষ এক গ্লাস পানি পর্যন্ত নিজে গড়িয়ে খান না, তাঁর এ রকম কাণ্ডে ভেতরে-ভেতরে মরমে মরে যাই আমি। মা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু খুবই বিষণ্ন থাকেন সর্বক্ষণ, মাঝে-মধ্যে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। এরি মধ্যে নেত্রকোনার হাওর এলাকার 'খালিয়াজুরি'তে কর্মরত আমার বড়ভাই এসে গেছেন খবর পেয়ে। এসেছেন আমার বড়বোন নাগবাড়ী থেকে। আমার লজ্জার আর অবধি নেই। কী করে মুখ দেখাই বড় ভাই ও বোনকে!

আমরা দু'ভাই এক বোন। ভাই সবার বড়– আমার থেকে ১৩ বছরের বড় আর বোনটি ৭ বছরের বড়। বিয়ে হয়েছে নাগবাড়ীতে। 'তরফ গৌরাঙ্গী'র অপর এক গ্রামে, স্পিকার আবদুল হামিদ চৌধুরীর ভাইপোর সঙ্গে (মোজাম্মেল হক সিদ্দিকী)। এই বোনটিই আমাকে ছোটকালে কোলেপিঠে মানুষ করেছেন। ডাকনাম 'রেণু'। বড়ভাইয়ের ডাকনাম 'বালা'। বড়ভাই গম্ভীর, রেণু আপা বিষণ্ন। আপা নয় 'বুজি' বলেই ডাকি তাঁকে। অস্বস্তিকর পরিবেশ কাটতে কিছুটা সময় লাগল। যুক্তিপূর্ণ একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্কুলে গেলাম। সঙ্গে লোক থাকত আনা-নেয়ার জন্য। আগের

মতোই। তবে বিকালবেলাটায় শাসন একটু শিথিল হলো। আমার জ্ঞাতি দেলু দাদার কাছে লাঠিখেলা শেখার অনুমতি মিলল! এই এক আশ্চর্য মানুষ। আমার বাবার চেয়েও বয়সে বড়– কিন্তু পাকানো দড়ির মতো মাংসপেশি সারা গায়ে– লম্বায় ছয় ফুট। ছিপছিপে, ফরসা, ডালিম দানার মতো দাঁত, টিকোলো নাক। এককথায় সুন্দরের প্রতিমূর্তি। দেলু দাদাকে অঞ্চলের সবাই ভয় করত। আমাদের বংশের কারুকে কেউ কিছু বললে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। তিনি ছিলেন আশ্চর্য এক ওস্তাদ লাঠিয়াল। সারা তল্লাটে তাঁর নামে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল। দু'টো হাতই তাঁর সমান চলত। দুই হাতে দুই পাকা বাঁশের লাঠি তিনি বনবন করে ঘোরাতেন। এহেন ওস্তাদের হাতে লাঠিখেলা শেখার অনুমতি মিলল। বাবা কী ভেবে কেন এই অনুমতি দিয়েছেন– সে রহস্য আজো আমার অজানাই রয়ে গেছে। দেলু দাদা খুব যত্নে তাঁর কিশোর ছাত্রকে তালিম দিতে লাগলেন আমাদের বহির্বাটিতে। তিনি আমাকে খুব আদরও করতেন। তাঁর সঙ্গে আমাকে ব্যায়ামও করতে হতো– মুগুর ভাজতে হতো। মাঝে-মধ্যে দাদা-নাতির লাঠিখেলা বাবা দু'এক দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতেন। বাইরের ঘরে বাবা আবার তুখোড় আড্ডায় মেতে উঠলেন। গ্রামের সালিশ দরবারও সমান তালেই চলল।

ইতোমধ্যে দুজন সহপাঠীর সঙ্গে মেলামেশার অনুমতি মিলল– জয়নাল আবেদীন তালুকদার (শামসু) ও আবদুর রশিদ খান (হিরু)–এদের একজন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের ছেলে, অপরজন কালিহাতির হেডমাস্টারের ছেলে। এরা দু'জনই মেধাবী ছাত্র। অঞ্চলে ভালো ছেলে বলে পরিচিত। বিনম্র, ভদ্র। এদের সঙ্গে পড়াশোনা, গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানটাই প্রধান ছিল; সাহিত্যের তৃষ্ণা এদের মধ্যেও ছিল। তবে এতটা তীব্র ছিল না যতটা তীব্র হলে অন্য সব কিছু ছেড়েছুড়ে শুধু সাহিত্য নিয়েই মেতে থাকতে হবে। তারা ছিল সত্যিকার অর্থেই ভালো ছেলে এবং ভালো ছাত্র। দুজনেই অঙ্কে ভালো ছিল। পরবর্তী সময়েও তারা উভয়েই সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একজন কৃতী আইনজীবী, অপরজন কৃতী শিক্ষক।

৩

সাধুটী মিডল ইংলিশ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করলাম। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি। পাস করে এবার তো হাইস্কুলে ভর্তি হতে হয়। আমাদের বাড়ি থেকে সমান দূরত্বে দুই হাইস্কুল– ঘাটাইলে ও কালিহাতিতে। ঘাটাইল আমাদের থানা। কিন্তু ওই সময়ে কালিহাতি হাইস্কুলের সুনাম একটু বেশি। প্রত্যহ তিন-চার মাইল পথ হেঁটে স্কুলে যাওয়া– আবার তিন/চার মাইল পথ ভেঙে বাড়ি ফেরা– এভাবে তো আর পড়াশোনা হয় না। স্কুলের হোস্টেল আছে। কিন্তু বাবার ধারণা তাতে করে বখাটে ছেলেদের খপ্পরে পড়ে বখে যেতে পারে তাঁর ছেলে। স্থির হলো কালিহাতির একেবারে কাছাকাছি গঞ্জগ্রাম হামিদপুরের কোনো এক গরিব গেরস্থের বাড়িতে পেইয়িং গেস্ট হিসেবে আমাকে রাখা হবে। বাবা সেইমতো ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমার ল্যান্ড লেডির হাতে নিয়মিত নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ও চাল-ডাল দেয়া হবে। বিনিময়ে তার ঘরের বারান্দার কক্ষটি আমার জন্য ছেড়ে দেবেন তারা। নতুন বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়সহ বাবা নিজে গিয়ে ওঠালেন আমাকে নতুন ওই আস্তানায়। ইতোমধ্যেই 'কালিহাতি রামগতি শ্রীগোবিন্দ হাই ইংলিশ স্কুলে' নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে গেছি।

সম্পূর্ণ স্বাধীন, শাসন-বারণহীন দিনরাত্রি। কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ জীবনের শেষ। অফুরন্ত স্বাধীনতা। অনভ্যস্ত এই স্বাধীন জীবন নিয়ে আমার দিশেহারা অবস্থা! মা'র জন্য মনটা খারাপ লাগে। বাড়ির জন্য মন কাঁদে। প্রথম-প্রথম কিছুদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ছুটে চলে যাই মা'র কাছে। অভ্যস্ত হয়ে উঠি ক্রমশ নতুন জীবনে। সাধুটী স্কুলের পুরনো দুই সহপাঠীও একই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আরো সব নতুন সহপাঠী। সবার সঙ্গেই ভাব হয়ে গেল। এরমধ্যে সবচেয়ে তুখোড়, তীক্ষ্ণ, মেধাবী এক 'বিস্ময় বালক'– মাঈন উদ্দিন

আহমেদ। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। প্রথম শ্রেণি থেকেই বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে। সব শিক্ষকের প্রিয় ছাত্র। খাঁটি কৃষকের ছেলে। সময় পেলেই চাষবাসে তার বাবাকে সাহায্য করে। অশক্ত অন্য কৃষকের ক্ষেত চষে দেয়। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে সারাক্ষণ। সবার চোখের মণি। পড়ালেখায়ও অদ্বিতীয়। রাত জেগে পুষিয়ে নেয় পড়াশোনা। সবগুলো বিষয়েই তার অনায়াস দখল। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি ঝোঁকটা একটু বেশি। তার মুখেই আমি প্রথম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনি। *দিবারাত্রির কাব্য*, *পদ্মা নদীর মাঝি*, *পুতুল নাচের ইতিকথা*। ইংরেজির শিক্ষক দ্বিজেন বাবু একটু বেশি ভালোবাসেন তাকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিএ (অনার্স) এমএ বিটি। টাইফয়েডে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অসাধারণ এক শিক্ষক। এত যত্ন করে তিনি পড়াতেন আমাদের যে, এখনো যেন তাঁর জলদগম্ভীর উচ্চারণ শুনতে পাই। যাহোক, মাঈনের সংস্পর্শে এসে ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। মাঈনকে ঘিরে আমরা আরো জনাদশেক একসঙ্গে ওঠাবসা শুরু করি। আড্ডা দিই, একই রঙের কাপড় পরি। আমার বন্ধু মাঈনই আমার আড্ডার প্রথম গুরু। আড্ডা যে কতটা আনন্দময় হতে পারে, প্রাণদায়িনী হতে পারে, তা প্রথমে এই 'বিস্ময় বালক'-এর কাছ থেকেই শেখা। ১৯৫৮ সালের পুরোটা সময় অর্থাৎ নবম শ্রেণির পুরোটা বছর কালিহাতী গঞ্জের সময়টা এক আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে কাটে। একদিকে সদ্যলব্ধ নতুন 'স্বাধীনতা', অপরদিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু 'বিস্ময় বালক' মাঈনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। প্রিয় শিক্ষক দ্বিজেন বাবু ও তার পরিবারের সবার মনোযোগ পেয়ে ধন্য এই কিশোর উড়তে থাকে ডানা মেলে। থাকি হামিদপুরে। একটা ছোট্ট খরস্রোতা নদী হামিদপুর ও কালিহাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। যেন ছোট্ট একটা সূক্ষ্ম রুপালি রেখা দ্বিখণ্ডিত করে রেখেছে অখণ্ড এক হৃদয়কে। বড় দু'টি নৌকাকে জুড়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে 'গুদারা'। এই দিয়েই পারাপার হয় যাত্রীবাহী বাস এবং লরিসহ যাবতীয় যানবাহন। টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের এই রাস্তা হয়েই তখন ঢাকায় আসতে হতো। এই যে ছোট্ট স্রোতস্বিনী যার ডাকনাম 'ফটিকজানি', আসল নাম 'স্ফটিকজল নদী'! গুদারা ঘাটের মালিক মাড়োয়ারি। তারা সবাই দীর্ঘদিন এখানে বাস করেন। এদের ছেলেমেয়েরা এখানেই পড়াশোনা করে। এদের একজন মাধবলাল মোদী

আমার বন্ধু ও সহপাঠী। গুদারা পারাপারে পয়সা লাগত। একাআনা জনপ্রতি। বাসযাত্রীদের তা দিতে হতো না। বাসপ্রতি দুই টাকা, লরি তিন টাকা। গুদারার মাঝিমাল্লা সবাই ছিল উড়িয়া– উড়িষ্যাবাসী। হাঁটুর ওপরে ধূতি পরত সবাই। বিচিত্র সব শব্দে কথা বলত তারা নিজেদের মধ্যে। কিন্তু ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলত– বড় মধুর সে ভাষা। নিজেদের মধ্যে 'আইছন্তি', 'যাইছন্তি' করত। আর অবসরে গুদারা ঘাটের গদিতে বসে 'খৈনি' খেত। গুদারার ওই মাঝিমাল্লাদের আমার স্বপ্নলোকের বাসিন্দা বলে মনে হতো। যে সময়টার কথা বলছি এই সময়ে আমাদের দেশে, দেশবিভাগের ১১ বছর পরেও, কোনো ধর্মীয় 'জজবা' ছিল না। মাধবদের বড়ভাইদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। গুদারাঘাট সংলগ্ন ওদের বাড়িতে আমরা বন্ধুরা মিলে অনেক আড্ডাও দিয়েছি। বলাই বাহুল্য, এই আড্ডার মধ্যমণি ছিল আমার বন্ধু মাঈন। গুদারার ঘাটটি ছিল কালিহাতির পারে, অপরদিকে হামিদপুরের পারে ছিল বিরাট এক বেদে নৌকার বহর। পারে ঘন কলাগাছ ঘেরা সব বাঁশবাখারির ঘরদোর। কূলের বাড়িঘর ও নৌকাতে ছিল এই বেদে বহরের বাস। 'উভচর বেদে' আর কোথাও আমি পরবর্তী জীবনে দেখি নি। বেদে বহরের বেশ ক'জন কিশোর আমার বন্ধু বনে যায়। ওই সময়েই ওই ওদেরই একজনের হাতে আমার 'আসব পানের' হাতেখড়ি। মাটির পাত্রে এক ধরনের তরল পদার্থ রক্ষিত থাকত। কাচের গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করা হতো। ওই আসব পানের বিশেষ নিয়মও ওরাই শিখিয়েছিল– গ্লাসটি হাতে নিয়ে অপর হাতে নাক চেপে পান করতে হতো। পানের পর টের পেতাম গলা দিয়ে এক ধরনের তরল অনল নেমে যাচ্ছে। পানের ওই সময়টা বুক জ্বলে যেত, কিন্তু একটু পরে বেশ এক ধরনের ভালো লাগা বোধ। এরপর বেশ ফুরফুরে একটা অনুভূতি। প্রথম অভিজ্ঞতার কথা মাঈনকে বলাতে সে আমাকে এই মারে তো সেই মারে। 'একি করেছিস, জীবন, ছিঃ ! এ কোনো ভদ্র সন্তান পান করে? ভদ্রসন্তানের পানীয় হলো– আঙুরের নির্যাস। এই বস্তু গণ্ডগ্রামে কোথায় পাবি বল, বড় হয়ে বড় শহরে যখন যাবি তখন পান করিস। এসব আর কখনো নয়, না। সৈয়দ মুজতবা আলী পড় তবেই এসব বুঝবি।' আমি তো হাঁ, এত জ্ঞান মাঈনের! পরে সে মুজতবা আলী আমাকে পড়িয়েছিল। অসাধারণ পণ্ডিত। মাঈনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। মাঈন আরো কত

কী যে বিচিত্র সব জ্ঞানের কথা আমাদের বলত। যেন পৃথিবীর সবকিছুই ওর নখদর্পণে। ওর যেন কিছুই অজানা নেই।

মাঈন একদিন সন্ধেবেলা ফটিকজানির কোল ঘেঁষে নির্মিত ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি পুরোটা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল এক স্বপ্নাবিষ্ট স্বরে। আজো কানে বিঁধে আছে সেই স্বর। সে ছিল শ্রুতিধর। এরকম স্বাপ্নিক ও স্বপ্নচালিত মানুষ এই জীবনে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। পরবর্তী জীবনে কোনো-কোনো মুহূর্তে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে এ রকম ঘোরের মধ্যে বিচরণ করতে দেখেছি। তবে সে-ও সুরার প্রভাবে। স্বাভাবিক সময়ে নয়। কিন্তু এই 'বিস্ময় বালক', পানটানের সঙ্গে যার কোনোই সম্পর্ক ছিল না। তার ঘোরটা অন্যরকম ছিল। তার চোখে ছিল স্বপ্ন এবং সংকল্প ছিল সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের। এক বছরের মধ্যে ক'টি ব্রিলিয়ান্ট কিশোর অবাধ স্বাধীনতাকে কী যে অপব্যবহার করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৎসরান্তে তাদের পরীক্ষার ফলাফল দেখে। এই বার্ষিক পরীক্ষায় মাঈন, যে জীবনে দ্বিতীয় হয় নি এ যাবত– সে হয় তৃতীয়, আমরা বাকি দশজন কেউ দু/তিন সাবজেক্টের বেশি কোনোটাতে পাস করতে পারি নি। বুঝতেই পারছেন, এক বছরে আমরা সবাই কতটা বখে গিয়েছিলাম।– আমি বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া আর সব বিষয়ে ফেল করেছিলাম, তাও বাংলায় ৩৭ এবং ইংরেজিতে ৩৩। সারাটি বছর নানা ধরনের নতুন-নতুন দুষ্টুমিতে জড়িয়ে গিয়ে এই পরিণাম। বাবা মন খারাপ করে বড়ভাইকে কর্মস্থল থেকে 'তার' করে আনলেন। বসল বৈঠক বাপ-বেটায়। কী করা যায় এই অপোগণ্ড অকালকুষ্মাণ্ডকে নিয়ে! ঠিক হলো আর দূরে রাখা যাবে না ওকে। রাখতে হবে চোখে চোখে, এরি মধ্যে বাড়ির কাছে ব্রাহ্মণশাসনে মাদ্রাসা হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়ে যাত্রা শুরু করেছে। ঠিক হলো ব্রাহ্মণশাসনেই ভর্তি করা হবে। অঙ্কে স্পেশাল কোচিং দেয়া হবে এবং পড়াশোনার ব্যাপারে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে। হলোও তাই। নিজের ভেতরে এক ধরনের repentance, শোচনা এল। চলল মরণপণ সাধনা। দু'বছরের পড়াশোনা এক বছরে সমাপ্ত করতে হবে। বছর মার দেয়া চলবে না। হেডমাস্টার ইউসুফ স্যার ইংরেজি সাহিত্যের মানুষ, সুফিবাদী। ঘাড় অবধি ব্যাকব্রাশ করা বাবরি চুল। পাজামা-পাঞ্জাবি, পাম্প সু। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, ফরসা, বসন্ত মুখ! সদাহাস্য। এবং এক ধরনের দীপ্তি রয়েছে তার চোখে-মুখে। আত্মতৃপ্ত। খুবই আকর্ষণীয় চেহারা। ব্যক্তিত্ববান। কিন্তু ভয়াবহ নন। নির্দ্বিধায় বলা যায় সমস্যার কথা; চাওয়া যায় সমাধান।